জীবন বাঁচানোর সংগ্রাম

জামায়াত নেতা মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের ফাঁসির দন্ড রহিত করার আবেদন জানিয়ে আমরা একটি বিবৃতি প্রচার করেছিলাম ২০১৪ সালের ৫ নভেম্বর। এরপর মি. কামারুজ্জামান রায়ের বিপরীতে আপিল করেছেন এবং সেই আপিলও উচ্চ আদালতে টেকেনি। এখন শুধু তার রায়ের বাস্তবায়নের অপেক্ষা।

আমরা সরকারের কর্তাব্যক্তিদের কাছে এটাও আবেদন করেছি যে যদি মি. কামারুজ্জামান ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাহলে সরকার যেন সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মি. কামারুজ্জামান এখনো ক্ষমা প্রার্থনা করেননি। তবে তিনি যদি ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, তাহলে প্রচলিত আইনে তার প্রাণ বাঁচানোর আর কোন রাস্তা খোলা থাকবে না।

কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়। আমরা এই রায় সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে অপারগ। তবে আমাদের আশঙ্কা প্রায় চল্লিশ বছর আগে সংঘটিত ঘটনাগুলোর জন্য একজন ব্যক্তিকে যদি ফাঁসির দন্ডে দন্ডিত করা হয়, তাহলে সেই দন্ডে ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। আমাদের এই আশঙ্কা থেকেই আমরা মহামান্য বিচারপতিদের কাছে আবেদন

জানিয়েছিলাম তারা যেন মি. কামারুজ্জামানকে অন্তত ফাঁসি না দেন। তবে আমাদের সেই আবেদনে কোন কাজ হয়নি।

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে মৃত্যুদন্ডবিরোধী একটি জনমত ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, এবং জাতিসংঘ বিভিন্ন সময়ে তাদের মৃত্যুদন্ড বিরোধী অবস্থান পরিস্কার করেছে। এই মামলার বেলাতেও তারা একই অভিমত দিয়েছে।

তবে এতোদিন মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে কথাবার্তা শুধুমাত্র বিদেশীদের মুখেই শোনা যেত। বাংলাদেশের ভিতর থেকে এই ব্যাপারে উদ্যোগ কিংবা লেখালেখি সাম্প্রতিককালের আগে কখনো দেখা যায়নি।

এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভিতরে মৃত্যুদন্ডবিরোধী জনমত সৃষ্টিতে যিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন, তিনি হলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক মি. শফিক রেহমান।

অতি সম্প্রতি তিনি তার একাধিক লেখার মাধ্যমে তার নিজস্ব মৃত্যুদন্ডবিরোধী অবস্থান তুলে ধরেছেন। তিনি যুক্তিনির্ভর এবং তথ্যবহুল লেখার মাধ্যমে দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশে যেন মৃত্যুদন্ড নিষিদ্ধ করা হয় এবং যাবজ্জীবন কারাদন্ডকে সর্ব্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে ঠিক করা হয়। এই ব্যাপারে জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি একটি ফেসবুক পেজও খুলেছেন।

তার এই অসাধারণ উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। মৃত্যুদন্ডের মত একটি বিষয় নিয়ে যে পাতার পর পাতা লেখা যায়, এবং জনমত সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করা যায়, মি. শফিক রেহমানের সাম্প্রতিক এই উদ্যোগগুলো না দেখলে আমরা হয়তো এই বিষয়ে কোন ধারণা পেতাম না।

আমরাও মৃত্যুদন্ডের বিপক্ষে, তবে অন্তত কয়েকটি কারণে মৃত্যুদন্ডকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার পক্ষে আমরা নই। আমরা বরং মৃত্যুদন্ড রেখেই মানুষের প্রাণ বাঁচানোর সংগ্রামে আগ্রহী। এই ব্যাপারে অল্প কথায় আমরা আমাদের যুক্তিগুলো তুলে ধরছি।

প্রথমত মৃত্যুদন্ড যদি নিষিদ্ধ করে ফেলা হয়, তাহলে আমাদের আশঙ্কা এতে নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। তাদের অধিকার রয়েছে তাদের নিকট আত্মীয়ের হত্যার বদলা হিসাবে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে একই শাস্তি লাভ করার।

মৃত্যুদন্ডকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে যদি নিহত ব্যক্তিবর্গের ভুক্তভোগী আত্মীয়-স্বজনরাই সবার আগে দাবি জানাতেন, তাহলে এই ব্যাপারে জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা আরো বেশি যৌক্তিক হত।

কিন্তু সারাবিশ্বে এই ধরনের ভুক্তভোগীরা আদৌ মৃত্যুদন্ডের বিলোপ চান কিনা, সেই ব্যাপারে কোন জরিপ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তাই তাদের মতামত না নিয়েই যদি মৃত্যুদন্ড নিষিদ্ধ করে ফেলা হয়, তাহলে হত্যাকারীর বেঁচে থাকার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে আমরা অধিকার বঞ্চিত করব নিহত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়-স্বজনদেরকে।

মৃত্যুদন্ডকে নিষিদ্ধ না করার ব্যাপারে আরো একটি শক্ত যুক্তি রয়েছে।

মৃত্যুদন্ডের মাধ্যমে একজন মানুষের প্রাণ বাঁচানোর যে বিরল সুযোগের সৃষ্টি হয়, তা বোধকরি আর কোন ঘটনার মাধ্যমে সম্ভব নয়। মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারা কিন্তু সহজ কাজ নয়। একজন ব্যক্তি চাইলেই আরেকজন ব্যক্তির প্রাণ বাঁচাতে পারে না।

একজন ডাক্তার শতভাগ গ্যারান্টি দিয়ে কখনো বলতে পারেন না তিনি চিকিৎসা দিয়ে একজন মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন।

একজন প্রবল ক্ষমতাধর রাষ্ট্রনায়কও শতভাগ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারেন না, বিপদের সময়ে তার দেশের মানুষের জীবন তিনি বাঁচাতে পারবেন।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিছনে প্রবল ক্ষমতাধর সেনাবাহিনী থাকা সত্বেও তার অফিসের অদুরে পিলখানাতে ৫২ জন সেনা অফিসারের প্রাণ তিনি বাঁচাতে পারেননি।

একই ঘটনা ঘটেছে রানাপ্লাজার ব্যাপারেও। এই ভবনটি যে কোন সময়ে ভেঙে পড়তে পারে, এই ব্যাপারে সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল দেশের সকল মিডিয়াতে। কিন্তু তারপরও কোন উদ্যোগ না নেয়াতে মানুষের মৃত্যু আটকানো যায়নি।

কিন্তু মানুষের এই অক্ষমতার কারণ কি?

এর কারণ একজন মানুষ কবে মারা যাবে, কিভাবে মারা যাবে, তার সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার আল্লাহপাক সম্পূর্ণ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। মানুষের হাতে তিনি এই ক্ষমতা দেননি। তবে ব্যতিক্রম শুধু মৃত্যুদন্ডের বেলাতে।

অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে আল্লাহপাক মৃত্যুক্ষণ নির্ধারণ করার ক্ষমতা নিজের কাছে না রেখে তার সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার অনেকখানিই ছেড়ে দিয়েছেন পুরোপুরি মানুষের উপর। এখন মানুষ এই বিশাল ক্ষমতার ব্যবহার করবে, নাকি অপব্যবহার করবে, সেই সিদ্ধান্ত নেবে মানুষ, আলাহ্ নন।

অন্তত মৃত্যুদন্ডের ক্ষেত্রে মানুষ আগেভাগেই জানতে পারে একজন ব্যক্তি কখন মারা যাবে, কিভাবে মারা যাবে। আর তাকে যদি বাঁচাতে হয়, তাহলে ঠিক কি কি কাজ করতে হবে।

একজন ব্যক্তি দোষী হোক কিংবা হোক নির্দোষ, তার জীবন বাঁচাতে পারাকে ইসলাম ধর্মে তুলনা করা হয়েছে সম্পূর্ণ মানবজাতির জীবন বাঁচানোর সাথে। আর এভাবেই মহান আলাহ্পাক মানুষকে সুযোগ করে দিয়েছেন একজন ব্যক্তির জীবন বাঁচানোর বিনিময়ে এক বিরাট পুণ্য অর্জনের।

যারা মৃত্যদন্ড নিষিদ্ধ করে ফেলেছেন, তাদের বেলাতে এই পুণ্য অর্জনের কোন সুযোগ তারা নিজেরাই রাখছেন না। অথচ দুটি পদক্ষেপেরই ফলাফল কিন্তু এক।

মৃত্যুদন্ড রেখেই মানুষের প্রাণ যদি বাঁচানো যায়, তাহলে সমাজে ক্ষমাশীলতার চর্চা বাড়বে। সেই সাথে বাড়বে মানুষকে ভালবাসার চর্চাও।

যে ব্যক্তি সফল, সুপরিচিত, তাকে সবাই ভালবাসবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষকে ভালবাসার প্রকৃত পরীক্ষা হবে শুধু তখনই যখন একজন দন্ডিত ব্যক্তির পক্ষে মানুষ তার ভালবাসার প্রকাশ ঘটাবে।

আর সেই পরীক্ষাতে যদি পাশ করা যায়, তাহলে শক্তিশালী হবে আইনের শাসন, শক্তিশালী হবে গণতন্ত্রও।

ক্ষমা করতে না পারার ব্যর্থতার কারণে আমাদেরকে জাতিগতভাবে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। আমরা ক্ষমা করতে পারি না বলেই আমাদের ছাত্ররা একে অপরকে গুলি করে মেরে ফেলে।

আমাদের রাজনীতিবিদরা একে অপরকে ক্ষমা করতে পারেন না বলেই দেখা দেয় রাজনৈতিক অস্থিরতা। ফলে বাধাগ্রস্থ হয় দেশের অগ্রগতি।

তাই দেশের ভবিষ্যত অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে ক্ষমাশীলতা চর্চা করার বিকল্প কিছু নেই।

আমরা জানি না আমাদের এই কথাগুলো বাংলাদেশের ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের কাছে কতটুকু মূল্যায়িত হবে। তবে বরাবরের মত যদি এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়, তাহলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে আমরা অন্তত একজন ব্যক্তির প্রাণ বাঁচানোর ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলাম।

আইডিয়াস ফর ডেভলপমেন্ট
এপ্রিল ১০, ২০১৫

ছবিসূত্রঃ ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত।